স্বাগতম শুভ নববর্ষ ১৪২৩

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১লা বৈশাখ ১৪২৩
১৪ই এপ্রিল ২০১৬

বাণী

শুভ নববর্ষ। নববর্ষের এই আনন্দঘন দিনে আমি দেশবাসীকে জানাই বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা।

বর্ষশেষে নতুনের বারতা নিয়ে বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে নতুন করে আবির্ভূত হয়। বেজে ওঠে আগমনী সুর। সে সুর নতুনকে বরণ করার, পুরাতনকে পেছনে ফেলে নব উদ্যমে আগামীকে আবাহন করার। বৈশাখ শুধু ঋতুচক্রের ধারাবাহিকতা নয় বরং বাঙালির হাজার বছরের শাশ্বত চেতনারই নাম। এই চেতনা মিশে আছে আমাদের দৈনন্দিন কর্মে, চেতনায়, ঐতিহ্যে। মোগল সম্রাট আকবর ফসলি সন হিসেবে বাংলা সন গণনার সূত্রপাত করেন যা কালক্রমে বাঙালির ঐতিহ্যগত উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা সন গণনার সঙ্গে যেমন ফসল ও মৃত্তিকার ভাবনা জড়িয়ে আছে তেমনি এর সাথে মিশে আছে বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য।

শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও বাংলা নববর্ষ উৎসবের কোনো তুলনা নেই। সারাদেশে পহেলা বৈশাখের পূর্বে চৈত্রসংক্রান্তি থেকে দেশের নানাস্থানে শুরু হয় বৈশাখী মেলা, হাট, আড়ংসহ নানা আয়োজন। বৈশাখী মেলাগুলোতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত পণ্যের যে বিপুল বেচাকেনা হয়, তা জাতীয় অর্থনীতিকে বেগবান করার পাশাপাশি মানুষের মাঝে মৈত্রী ও সম্প্রীতি স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বাঙালির জীবনে বাংলা নববর্ষের আবেদন চিরন্তন ও সর্বজনীন। অতীতের সব গ্লানি ও বিভেদ ভুলে বাংলা নববর্ষ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের ঐক্য ও সংহতি আরও সুদৃঢ় করবে এবং বয়ে আনবে অফুরন্ত আনন্দের বারতা, বাংলা নববর্ষে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ সবার জন্য শুভ ও কল্যাণকর হোক।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১লা বৈশাখ ১৪২৩
১৪ই এপ্রিল ২০১৬

বাণী

বাংলা নববর্ষ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এটি আজ ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালির জীবনে সর্ববৃহৎ উৎসব ও মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। পয়লা বৈশাখ কেবল গ্রামবাংলায় নয়, শহুরে মানুষের জীবনকেও স্পর্শ করেছে আনন্দে-উৎসবে। সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের সংস্কৃতিই যে চিরায়ত বাঙালির প্রাণসম্পদ, বাংলা নববর্ষের শুভলগ্ন সে কথাটিই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি সংস্কৃতিসমৃদ্ধ এক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আজকের বাংলাদেশ যে নববর্ষ উদ্‌যাপন করে তা তাঁরই স্বপ্নের প্রতিফলন। বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক চেতনায় তরুণ প্রজন্ম বেড়ে উঠুক। একই সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ, বাংলা নববর্ষের শুভদিনে এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি

বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার এবং বাংলা তারিখের বিভ্রান্তির দায় কার?

শামসুজ্জামান খান

১৯৫২ সালে ভারত সরকার প্রখ্যাত জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানী (Astrophysicist) ড. মেঘনাদ সাহাকে প্রধান করে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করে। প্রফেসর সাহা এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ সালে পঞ্জিকা সংস্কার সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেন।

ড. সাহা কমিটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা করে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা শকাব্দের বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার সাধন করেন, সেই রিপোর্টে তিনি বাংলা পঞ্জিকারও অনুরূপ সংস্কার প্রস্তাব পেশ করেন। পূর্ববাংলায়ও পঞ্জিকা সংস্কারের লক্ষ্যে ঢাকার বাংলা একাডেমি ১৯৬৩ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে একটি পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করে। এ কমিটি মূলত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড. সাহার সংস্কার প্রস্তাবের মর্মানুযায়ীই বাংলাদেশে বাংলা পঞ্জিকা সংস্কারের প্রস্তাব করেন। কারণ পঞ্জিকা মূলতই জ্যোতির্বিজ্ঞান নির্ধারিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। পঞ্জিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্মত বিন্যাস না হলে সময়ের বিপুল হেরফের হয়ে যেতে পারে। একটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলায় নববর্ষ ছিল ১১ই এপ্রিল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পঞ্জিকার বিজ্ঞানসম্মত বিন্যাস না হওয়ায় বিগত চারশ বছরে তিন বা চারদিনের হেরফের হয়ে গেছে। এখন বাংলাদেশে আমরা নববর্ষ উদ্‌যাপন করি রোমান ক্যালেন্ডারের ১৪ই এপ্রিল তারিখে। পশ্চিমবাংলায় করে ১৪ বা ১৫ তারিখে। পশ্চিমবাংলা সাহা কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করেননি। তার ফলে আমরা যেমন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকার বিজ্ঞানসম্মত বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ১৪ই এপ্রিলকে পহেলা বৈশাখ হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিতে পেরেছি পশ্চিমবাংলা তা পারেনি। ফলে তাদের দেশে একশ বছরে ২৫টির পরিবর্তে ২৬টি অধিবর্ষ হবে। আর চারশ বছরে ১০০টির পরিবর্তে হবে ১০৩টি অধিবর্ষ। শুধু তাই নয়, চারহাজার বছর পরে পশ্চিমবাংলায় পহেলা বৈশাখ হবে জুন মাসে। বিজ্ঞানের পরিবর্তে সংস্কার এবং অপবিজ্ঞানভিত্তিক বাজারি পঞ্জিকার ওপর নির্ভরশীলতার কারণেই পশ্চিমবাংলার দিন-তারিখ নির্ধারণে এমন বিধিকিচ্ছি কাণ্ড ঘটবে। এখনই নববর্ষ, রবীন্দ্র-নজরুলজয়ন্তী আমরা যখন পালন করি পশ্চিমবাংলা করে তার একদিন পরে। অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করে সংস্কারাচ্ছন্ন পঞ্জিকা নির্ভরতা ইতোমধ্যেই তাদের একদিন পেছনে ফেলে দিয়েছে। এই সমস্যা যেন আমাদের এখানে না হয় সেজন্যই ১৯৬৩ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পঞ্জিকা সংস্কার প্রস্তাবে যে সংস্কার করা হয় তা ছিল নিম্নরূপ :

বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত প্রতি মাস ৩১ দিন এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র প্রতি মাস ৩০ দিনে গণ্য করা হবে এবং যে বছরে লিপ-ইয়ার বা অধিবর্ষ হবে সে বছরে চৈত্র মাস হবে ৩১ দিনে। এরপরে আশির দশকে বাংলা একাডেমি কর্তৃক একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে বাংলা পঞ্জিকার অধিকতর উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে যে প্রস্তাব করা হয় তাতে বলা হয়, মাসের দিন নির্ধারণে পূর্বোক্ত পদ্ধতি বলবৎ থাকবে। তবে রোমান বা গ্রেগরিয় বর্ষপঞ্জির অধিবর্ষে যে বাংলা বছরে ফাল্গুন মাস পড়তো সেই বাংলা বছরকে অধিবর্ষ গণ্য করা হবে। অধিবর্ষে চৈত্র মাসের পরিবর্তে ফাল্গুন মাসে ৩১ দিন হবে। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী রাত ১২টায় তারিখ পরিবর্তন হবে। বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত বাংলা সনের এ বৈজ্ঞানিক সংস্কার বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে এবং এখন তা সারাদেশে সরকারিভাবে চালু রয়েছে।

ভারতবর্ষে মেঘনাদ সাহা এবং এস. পি. পান্ডে জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্মতভাবে পঞ্জিকা সংস্কার করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে বাংলা তারিখে একদিনের হেরফের হয়ে গেছে। কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলা একাডেমি পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির প্রস্তাব বাস্তবায়ন করে সুবিবেচনার পরিচয় দেয়নি। এবং এর ফলে বাংলা তারিখ নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তার দায় বাংলাদেশের। এ বক্তব্য এবং যুক্তি যে

অবৈজ্ঞানিক, অসত্য এবং দায়িত্ব-জ্ঞানহীন আমরা তা ভারতবর্ষের পঞ্জিকাবিশেষজ্ঞ এবং Indian Journal of History of Science 39.4 (2004) 519-534 সংখ্যার বিস্তৃত তথ্যমূলক প্রবন্ধ থেকে প্রমাণ করব।

ড. সাহা কমিটির প্রস্তাব যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়ায় ১৯৮৬ সালে ভারত সরকার প্রফেসর এস. পি. পান্ডের সভাপতিত্বে আরেকটি পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করে। এ কমিটি ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। পান্ডে কমিটি পঞ্জিকা সংস্কারে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত, ধর্মসম্পৃক্ত নানা বিষয় বিবেচনা করে তাদের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এবং এ কাজে পঞ্জিকাকার বা জ্যোতিষীদেরও প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়। কমিটি দীর্ঘ যুক্তিতর্ক এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পর ড. মেঘনাদ সাহার পঞ্জিকা সংস্কারের সায়ন পদ্ধতি থেকে ঐতিহ্যগত নিরায়ন পদ্ধতিতে ফিরে আসেন এবং আরও দুএকটি ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। ভারত সরকার পান্ডে কমিটির উপর্যুক্ত প্রস্তাব বিচার-বিশ্লেষণ করে ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে তা গ্রহণ করে।

বর্তমান লেখায় পান্ডে কমিটির বিস্তারিত ও অনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার সুযোগ নেই। তবে আমরা মূল বিষয়গুলো উল্লেখ করেই বোঝাতে পারব বাংলা পঞ্জিকার সংস্কারে বাংলাদেশের সাহসী পদক্ষেপ ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং পঞ্জিকা বিশেষজ্ঞদের মতের মোটেই বিরোধী নয়, বরং বলা চলে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা বাংলা সন সংস্কারের যে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা-ই বাংলাদেশের পঞ্জিকাবিশেষজ্ঞ এবং পণ্ডিতেরা গ্রহণ করেছেন। এর কারণ হলো, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় ভারত-বাংলাদেশসহ সব দেশের সিদ্ধান্ত তো একই হবে, হয়েছেও তাই। অথচ না জেনে, না বুঝে কিছু কিছু শিক্ষিত লোকও পঞ্জিকা সংস্কার এবং দুই দেশে তারিখের হেরফেরের জন্য বাংলাদেশকে দায়ী করে থাকেন। কিন্তু এই দাবি একেবারেই অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক। এর ফলে ভবিষ্যতে পঞ্জিকা গণনায় যে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে পশ্চিমবঙ্গ সে পথেই এগুচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্জিকা বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্বভারতীর সাবেক অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বসু বলেছেন, "হিন্দু পঞ্জিকাকারদের নিরায়ণ বর্ণনা নিতান্তই মান্ধাত্যা আমলের সেকালের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিরায়ণ ও গণনা পদ্ধতির ফলে অধিবর্ষের সংখ্যা প্রতি ১০০ ও ৪০০ বছরে যথাক্রমে ২৬ ও ১০৩টিতে পৌঁছে যাচ্ছে। বঙ্গদেশের ঋতুচক্রের সঙ্গে তার মাসের চিরন্তন সম্পর্কে ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে কয়েক হাজার বছর পরে বৈশাখ মাসের শুরু আর গ্রীষ্মে হবে না, হবে বর্ষায় অর্থাৎ জুন মাসে।" পশ্চিমবঙ্গের পঞ্জিকাকারেরা প্রকৃত সৌরবর্ষমানকে বাদ দিয়ে অবৈজ্ঞানিক নিরায়ণ বর্ষমানের ব্যবহার করেন। এই বর্ষমান যে সময়ে উদ্ভাবিত হয়েছিল তখন সূর্য পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করে বলে ধারণা ছিল। অথচ এখন আমরা তো সকলেই জানি পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে। এই মান্ধাত্যার আমলের অবৈজ্ঞানিক ধারণার ওপরই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্জিকাকারেরা তাদের পঞ্জিকার দিনক্ষণ নির্ধারণ করে থাকেন। এটা একেবারেই হাস্যকর।

পান্ডে কমিটিতে শুধু পঞ্জিকাবিশেষজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ছিলেন না, ড. বিভি রমন নামে এক জ্যোতিষী এবং দৈবজ্ঞ পঞ্জিকাকারও ছিলেন। তাদের সুবিবেচিত এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হলো "The year shall start with the month of vaishkha when the sun enters nirayana mesarasi, which will be 14th April of the Gregorian calendar" অর্থাৎ ভারতীয় পঞ্জিকাবিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি সুস্পষ্টভাবে ১৪ই এপ্রিলকে প্রতি বছর বাংলার নববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং ভারত সরকার ২০০২ সালে তা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ফাল্গুন মাসের ৩১ তারিখ যে অধিবর্ষ হবে তাও তারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এটাও নির্ধারণ করেছেন যে রাত ১২টায় নতুন দিনের সূচনা হবে। বাংলাদেশের পঞ্জিকা সংস্কারেও এ সিদ্ধান্তগুলোই গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের মতোই তা গ্রহণ করেছে এবং তার বাস্তবায়নও করা হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে ৪-৫টি বৃহৎ পঞ্জিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক স্বার্থের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নতি স্বীকার করায় পশ্চিমবঙ্গে সংস্কারকৃত পঞ্জিকাটি গৃহীত হতে পারেনি। তারা এখন মান্ধাত্যা আমলে আছে এবং দৈবজ্ঞদের রহস্যময় ও গোপন পদ্ধতিতে নির্মিত পঞ্জিকাকেই ব্যবহার করে চলেছে। এ মূঢ়তার ও অবিমৃশ্যকারিতার দায় বাংলাদেশের ওপর কেন বর্তাবে?

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১লা বৈশাখ ১৪২৩
১৪ই এপ্রিল ২০১৬

বাণী

বাংলা নববর্ষের এই শুভক্ষণে আমি দেশবাসী ও প্রবাসী বাঙালিসহ সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভ নববর্ষ।

চৈত্রের অবসানে নতুনের বার্তা নিয়ে আমাদের জীবনে বৈশাখের আগমনী সুর বেজে ওঠে। নববর্ষ মানেই নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হওয়ার দিন। আমাদের লেখক, কবি, শিল্পীদের ছন্দ, বর্ণ, তুলি ও সুরে বাংলা নববর্ষ প্রতি বছর নতুন রূপে হাজির হয়। পহেলা বৈশাখ থেকে দেশের নানাস্থানে শুরু হয় বৈশাখী মেলা ও আড়ংসহ নানা আয়োজন, যা বিনোদনের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে আনে নতুন গতি। তাই বাংলা নববর্ষ আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির এক বর্ণাঢ্য উৎসব ও অনন্য উৎসবিন্দু। বাঙালির সর্বজনীন উৎসব নববর্ষকে আমরা আবাহন করি প্রাণের স্পন্দনে, গানে-কবিতায়, আবেগের উত্তাপে।

আবহমান বাঙালির এ উৎসবে নতুন মাত্রা দিতে আমরা দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ উৎসব ভাতা প্রবর্তন করেছি। বাঙালির শাশ্বত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

বাংলা নববর্ষ আমাদের জাতীয়তাবোধ ও চেতনাকে শাণিত করে। বর্ষবরণের উৎসবে এ চেতনাকে নস্যাৎ করার জন্য স্বাধীনতার আগে ও পরে বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে। আঘাত করা হয়েছে বার বার। বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক শক্তির কোনো অপচেষ্টাই সফল হয়নি। বাঙালি জাতি নববর্ষকে ধারণ করেছে তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির অনুষঙ্গ হিসেবে।

আমি আশা করি, পহেলা বৈশাখে বাঙালি সংস্কৃতির এ চর্চা আমাদের জাতিসত্তাকে আরও বিকশিত করবে। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার শক্তি জোগাবে। রাজনীতির নামে সন্ত্রাস, আগুনে পুড়িয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা ও দেশের সম্পদ ধ্বংসকারী অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদেরকে আরও ঐক্যবদ্ধ করবে।

দেশব্যাপী বৈশাখী মেলা, চৈত্রসংক্রান্তির পালা-পার্বণ, নববর্ষের প্রতিটি মিছিল-শোভাযাত্রা পরিণত হোক মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বৈষম্য এবং ক্ষুধা-দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ারে। ১৪২৩ সন সকল জরা ও গ্লানি মুছে দিয়ে বাঙালির জীবনে বয়ে আনুক সুখ, সমৃদ্ধি ও অনাবিল আনন্দ–এই প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২শে চৈত্র ১৪২২
৫ই এপ্রিল ২০১৬

বাণী

ঋতুর আবর্তে আবার ফিরেছে বৈশাখ। ধাবমান কালের নিরন্তর পথ চলায় মৌসুমি রঙে আর ঢঙে বার বার সেজে ওঠে প্রকৃতি। জীর্ণ পুরাতনকে দূরে ঠেলে নতুন রঙে আর ভাবনায় জীবন এগোয় প্রাগ্রসর জীবনের দিকে। আবহমানকাল থেকেই বাংলার জনজীবনে বৈশাখ এসেছে নতুনের বার্তা নিয়ে। তাই তো বৈশাখ এলেই মনে স্বপ্ন আসে নতুনের। মন উন্মুখ হয় সুন্দর আগামীর আকাঙ্ক্ষায়।

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক জীবনের হালখাতা আর বৈশাখী মেলার একান্ত উৎসব কালক্রমে নাগরিক পরিমণ্ডল ছুঁয়ে সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে বিস্তৃত হয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র জুড়ে। প্রতি বৈশাখে তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র দেশ মেতে ওঠে বর্ষবরণের বর্ণিল আয়োজনে, নতুনের আবাহনে।

১৪২৩-এর বৈশাখে আমাদের এই শ্যামল ভূখণ্ডের মানুষেরা মানবিক মূল্যবোধে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে উজ্জীবিত হোক। সুন্দর আগামী আর সমৃদ্ধ বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষায় সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা।

০৫.০৪.২০১৬
আক্তারী মমতাজ

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার: বর্ষে বর্ষে নববর্ষ

হাসান আজিজুল হক

বাঙালির সবকিছুই বাঙালির সংস্কৃতি। এখানে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন আসে কেন? একজন জার্মানকে কি প্রশ্ন করা যাবে আপনি কি জার্মান? প্রশ্ন করলে সে বরং আশ্চর্যই হবে। সে অবশ্যই বলবে যে আমি যতদিন ধরে আছি, ততদিন ধরেই তো জার্মান? একজন ইংরেজকে যদি প্রশ্ন করা হয় আপনি কি ইংরেজ? আপনি কিসে ইংরেজ? আসলে এসব অবান্তর প্রশ্ন। তাহলে আমাদের বেলাতে এ প্রশ্ন উঠছে কেন? প্রশ্ন উঠছে, কারণ আমাদের কাজকর্ম নেই, করতেও চাই না, অবান্তরের মধ্যেই ডুবে আছি। আমরা আমাদের ভাগ করে ফেলেছি, বাঙালি আর বাংলাদেশি। এখন যদি বলা হয় বাঙালির কোনটুকু বাদ দিয়ে বাংলাদেশি, আর বাংলাদেশিটুকু বাদ দিলে যা থাকে, সেটাই বা কি এই প্রশ্ন কেউ করে না, কারণ এর উত্তর নেই। তার মানে এটা প্রশ্নই নয়।

বাঙালি সংস্কৃতির গঠনটাকে প্রথমে দেখতে হবে। সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায় সেটাও দেখতে হবে। এ বিষয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে। ড. গোলাম মুরশিদ একটি বই লিখেছেন, 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি'। বইটি যখন প্রকাশিত হলো, তখন তা নানা জায়গায় আলোচিত হয়েছিল। একটা আলোচনা মনে আছে, করেছিলেন সনৎকুমার সাহা। তিনি বলেছিলেন, পর্দা উন্মোচিত হলে যে মঞ্চটা আমাদের চোখে পড়ে, সেইটাই কি সব? তাহলে নবম-দশম শতাব্দী থেকে যে পর্দার উন্মোচন ঘটেছে, তার পেছনে কি কিছু নেই? আমরা বলি যে বাংলা ভাষার সঙ্গেই বাঙালি সংস্কৃতির সূচনা। এই অর্থে বাঙালি সংস্কৃতি হাজার বছরের পুরনো। এটা আমরা মোটামুটি মেনে নিয়েছি। তবু ধারণাটি পরিষ্কার নয়, সম্পূর্ণও নয়। একটার পর একটা প্রশ্ন এরপর করা যায়। সংস্কৃতির উষাকালের কথায় আমরা বলেছি, চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদিতম নিদর্শন। এই তর্কটাকে আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি, কেউ বলছেন অষ্টম শতাব্দীর শেষে, কেউ বলছেন দশম শতাব্দীতে। নানা রকম কথাই আছে। পরে যারা এই বিষয় নিয়ে আরো গবেষণা করবেন, ভাববেন, পাথুরে প্রমাণ বের করার চেষ্টা করবেন, তাদের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। হাজার বছরের যে ইতিহাসটা তুলে ধরতে চাইছি সেই ইতিহাসটার পিছনেও আরও কিছু অবশ্যই আছে, যা উন্মোচিত হয়নি।

জাতিত্বের কথাও ছলনাময় প্রসঙ্গ বটে। বাঙালি জাতির উদ্ভব কবে? সরাসরি কোনো জবাব নেই। আমরা হাজার বছর পিছিয়ে গিয়ে ইতিহাসের একটা খুঁট ধরলাম মাত্র। আরও কি হাজার বছর পিছিয়ে যাওয়া যায়? আর পিছিয়ে গেলে কি আরও অনেক শতাব্দীর ইতিহাসের উপস্থিতি কি মিলতে পারে? এই জাতি গঠনের ক্ষেত্রে, এই ভাষা গঠনের ক্ষেত্রে? বাংলা ভাষার আদিতম নিদর্শন ঠিক কোনো সাহিত্যিক রচনা নয়, কাব্যও নয়, গদ্যও নয়। মূলত সেগুলো রচিত হয়েছে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গভীর উপলব্ধি থেকে। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সমাজের উচ্চ কিংবা মধ্য শ্রেণির মানুষ নন। একেবারেই দারিদ্র্য-জর্জরিত অন্তেবাসী, ব্রাত্য শ্রেণিতেই তাঁদের অবস্থান। ভূখণ্ডের মূল বাসিন্দাদেরই অন্তর্ভুক্ত তাঁরা। শবরী, ডোম ইত্যাদি নিম্নবর্গের মানুষদের পৌনঃপুনিক উল্লেখ পাওয়া যায়। দোহা বলা হয়েছে এদের। নানা রাগরাগিণী ও তালের উল্লেখ থেকে মনে হয় এগুলো গীত হতো। এই গানগুলো যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁদের থেকেই যদি আমি বাঙালি সংস্কৃতির সূত্রপাত ধরতে চাই, তাহলে বোধ হয় মূলে পৌঁছুনো যাবে। তাহলে সমাজের অন্তেবাসী যাঁরা তাঁদের হাতেই বাংলা ভাষার প্রথম নির্মাণ। পুরো সমাজটার প্রতিনিধিত্ব তাঁরা নিশ্চয়ই করছেন না এবং ঐ চর্যাপদের পর থেকে মোটামুটি দুশো বছর ধরে আর বাংলা ভাষার কোনো নিদর্শনের খবর পাওয়া যাচ্ছে না। অন্তত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। জয়দেব হয়তো বাঙালি, কিন্তু তাঁর অতুলনীয় কাব্য 'গীতগোবিন্দ' বাংলা ভাষায় লেখা নয়। বাংলার বেশ কাছাকাছি নিয়ে আসা সংস্কৃত ভাষায়। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ এই দুই শতককে নিষ্ফলা শতক বলা হয়েছে, অন্ধকার শতক বলা হয়েছে, বাংলা ভাষার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি বলে। তাহলে আমরা যে খণ্ডটুকু পাচ্ছি, যেটাকে অবলম্বন করে আমরা সমাজ ও সংস্কৃতির গঠন সম্পর্কে ধারণা করতে চাইছি, তাতে অজস্র ফাঁকফোকর থেকে যাচ্ছে। এই ফাঁকফোকরগুলো যদি বের করতে পারা যায়, তাহলে বাঙালি সংস্কৃতির আদিতম চেহারাটার একটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। চর্যাপদের যুগে সমাজটা কেমন ছিল? ভাষার কথাটা যদি তুলি, তাহলে মুখে বলা আর সাহিত্যচর্চার ভাষাটা কি একই রকম ছিল? বাংলা ভাষার খবর পাওয়া যাক বা না যাক, চালু ভাষাগুলির চর্চা তো নিশ্চয়ই ছিল। ক্ষেত্রবাবু বলছেন, নিশ্চয়ই চর্চা বন্ধ ছিল না। সংস্কৃত ভাষা ছিল। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য চর্চা চলেছে। শিল্প-সাহিত্য চর্চা নিশ্চয়ই কিছু কিছু হয়েছে। এসব প্রশ্ন আজকের উত্তরাধিকার সূত্রের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলিম শাসনের সূচনা থেকে পরবর্তী একটা অধ্যায় শুরু হয়। মুসলিম শাসন প্রায় ছয়শো বছর চলেছে। এই ছয়শো বছরের মধ্যে একশো-দেড়শো বছর ধরে বাংলা ভাষার কোনো রচনা পাওয়া যায় না। চতুর্দশ, পঞ্চদশ শতক প্রায় পার হয়ে গেল। পঞ্চদশ শতকের শেষে এসে মোটামুটিভাবে আবার বাংলা ভাষার চর্চা দেখা যাচ্ছে। তাই এই সময়টার সমাজ গঠনটা আমাদের বিশেষভাবে ভাববার বিষয় আছে। আমার মনে হয় বাঙালি সংস্কৃতির প্রশ্নটাকে একটা সরল সাদাসিধে অনুমানের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলে আসল জায়গায় পৌছানো যায় না। সমাজগঠন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি সমস্ত কিছু জড়িয়ে আছে বলেই প্রশ্নটা জটিল আকার ধরে।

পরবর্তী অধ্যায় আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে ব্রিটিশ শাসন। আমরা এটাকে ঔপনিবেশিক শাসন বলছি। আজকের বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলতে গেলে এই দুশো বছরের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির কথাই প্রধান হয়ে ওঠে।

মনে হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের মতো এমন একটি বারোয়ারি বিষয়কে টেনে বাঁধা একটা সড়কে এনে ফেলা গেছে। ভাগ করা হলো তিনটি: প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক। আর একটা ভাগ হবে সাম্প্রতিক। ইচ্ছে হলে ভাগের ভাগ, আরও ভাগ করা যেতে পারে প্রাচীনের আদি আর অন্ত্য। মুসলিম শাসনের দিল্লির সুলতানি আমল আর স্বাধীন সুলতানি আমল। তারপর মুঘল আমল, কোম্পানি আমল, সাম্রাজ্যিক আমল। ভাগের পর ভাগ করতে অসুবিধা কিছু নেই। তবে মুশকিল হচ্ছে, এত করেও শেষ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। উত্তরাধিকারের প্রায় কিছুই বোঝানো যাবে না। বিশাল এক জাহাজ হাজার রকমারি জিনিসে পরিপূর্ণ হয়ে দিক-হীন সময়-সমুদ্রে ভেসে চলেছে। কোথায় ভিড়বে তার লক্ষ্য স্থির নেই। এত দ্রব্য, কিন্তু মোটেই থরে থরে সাজানো নয়। কে কার মধ্যে ঢুকে আছে, বলা কঠিন। সাদৃশ্যে-সাদৃশ্যে, বৈসাদৃশ্যে-সাদৃশ্যে, হিতে-বিপরীতে, সহজে-কঠিনে মিশে গেছে। এই হচ্ছে সংস্কৃতি। একে বাঁধা পথে এনে লাভ কিছু নেই।

তবে যত পিছনের দিকে যেতে চাই, তত আলো কিন্তু কমে আসবে। চেনা জিনিস আস্তে আস্তে অচেনা হয়ে উঠবে, জীবনের কলরব ধীরে ধীরে নীরব হতে থাকবে। ঘরবাড়ি, মানুষজন ক্রমেই অস্পষ্ট আবছায়ার মধ্যে ঢুকে পড়বে। মৃতের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। হয়তো ঘরবাড়ি, পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ, প্রথা-অভ্যাস, সংস্কার এক কথায় জীবন-যাপন অচেনা, অজানা, অস্পষ্ট হতে হতে যখন পুরোপুরি অপরিচয়ের মধ্যে তলিয়ে যাবে, সেখানেই আমাদের থামতে হবে। আর ঠিক সেখানেই সংস্কৃতির যাত্রাবিন্দুটি নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। ঐ যাত্রাবিন্দুটিই প্রথম ধাপ। বাঙালি সংস্কৃতিকে যুক্তিসিদ্ধভাবে অষ্টম-নবম-দশম শতাব্দী পর্যন্ত আমরা পিছিয়ে নিতে পেরেছি। আমরা মনে রাখি যে, সেই শুরুর ধাপের পর আমরা যত ধাপ একটির পর একটি পেরিয়ে যাই না কেন, একেবারে স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন, আলাদা নয় কেউ। একটি থেকেই আর একটি। যোগাযোগগুলো শুধু খুঁজে নেবার অপেক্ষা। বড়ো একটা পথের মোড়ের মতো, প্রবাহের এক-একটি বাঁকের মতো।

তবে ইতিহাসই আমাদের শেখায় যে, অছিন্নতারও ছেদ কখনও কখনও ঘটে, এক কাল আর এক কালে গিয়ে পৌঁছায়। প্রায় দ্বিখণ্ড, মাঝখানের সেতুবন্ধনকে খুঁজে পাওয়া একেবারে অসাধ্য না হলেও কঠিন হয়ে পড়ে। তখন বলতে হয়, সময়ের জোড়গুলি আলগা হয়ে গেছে, খুলে গেছে।

আদি বাংলাদেশের জায়গা থেকে হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের আংশিক শাসনকাল ইতিহাসের চোখে ধূসর; তাহলে ঐ বাংলাদেশেরই জায়গা থেকে পাল-সেন বংশের শাসনকে বৌদ্ধ-হিন্দু শাসন বলতে চাইলে হয়তো বলা যায়, একই সঙ্গে তাকে বিদেশি শাসন বলা চলে কি? অবশ্য ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলিম শাসনকে স্পষ্টতই বিদেশি বলা চলে। এসব বিবেচনা এখন অবান্তর হয়ে গেছে। ভাষা, সংস্কৃতি, নৃ-পরিচয়, সময়ের মহাঘানিতে পেষাই হয়ে একাকার হয়ে গেছে। নিরবচ্ছিন্নতার কথাটা এইজন্যেই খুব বড়ো হয়ে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে। তারপরও হিসেব করে দেখছি, বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম শাসনের মোট আটশো বছরের ছশো বছর কেটে গেছে মুসলিম শাসনে। এর মধ্যে কত যুদ্ধ, কত বিপ্লব-উপপ্লব, বিদ্রোহ, হত্যা, গুপ্ত হত্যা, রক্তপাত ঘটে গেছে। অবিচ্ছিন্নতার মূল সুতোটা কখনো ছিঁড়ে যায়নি। বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির এই গৌরব ও অহংকারের ঐক্যসূত্র অটুট থাকার একটি বড়ো কারণ হচ্ছে, পরিবর্তন, অস্ত্রের ঝনঝনানি, দখল, দাপট যা কিছু ঘটেছে, সব শাসকদের মধ্যেই, সমাজ, রাষ্ট্রকাঠামো, উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, জীবনযাপনের ব্যয়-বণ্টনের বেলায় পরিবর্তন শত শত বছরের মধ্যে কখনো মূলের দিকে যায়নি। এ এমন এক স্রোত, যেখানে উত্তাল ঢেউ ওঠেনি, প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে পুরো ভূখণ্ড প্লাবিত হয়নি, ভূমিকম্পে সমাজ-রাষ্ট্র ধসে পড়েনি। মুঘল আমলের আগে গোটা বাংলার বাস্তবতাটাও নির্দিষ্ট হয়নি। প্রায় আধা ঘুমন্ত, একঘেয়ে, অলস-মন্থর, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন এক দেশ-সমাজপট বিদ্যমান ছিল। না, না, আমার এই হঠকারী তথ্য-অসমর্থিত বেমক্কা রায়টার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আমি বাঙালির সৃজনশীলতা মানি, মানবিক প্রতিভা মানি, আমার অস্তিত্বের ঋণ স্বীকার করি; মধুর মানবিক গভীর সাহিত্য, শিল্প, লোকধর্ম, লোকযাত্রা, লোকশিল্প, মন্দির, মসজিদ, মূর্তিশিল্প, অগণ্য নারী-পুরুষের অনুপম হস্তশিল্প, কোনো কিছুই অস্বীকার করি না। এ সবেরই প্রাণবন্ত উপস্থিতি চাই আমাদের বর্তমানে। আরও, শিল্প-সাহিত্যে, লোকভাবনায়, ধর্মে-সংস্কৃতিতে, উপপ্লবগুলিও জানি, যে বন্যায় নবদ্বীপ ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়, তার খবর অমর বঙ্গবাসীরা চিরকালই জানবে।

কথাটা ঠিক ওখানে নয়, আমি কথাটাকে নিয়ে যেতে চাইছি আরো অনেকটা তলায়, সমাজ-রাষ্ট্রের একেবারে ভিত্তিতে। তাতে মনে হবে, শব্দ করেই যোগসূত্র ছিঁড়ে গেছে ১৭৫৭ সালে। শেষ অপরাহ্নে মুমূর্ষু আলো এসে পড়েছে সমাজ-রাষ্ট্রের গায়ে। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেই যাদের হাতে বৃহৎ বাংলা সুবে বাংলা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার অধিকার ও শাসনক্ষমতা এসে পড়ল, সে একটা বিদেশি বেনিয়া কোম্পানি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই শাসন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক শাসনের ভিতর দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনে পরিণত হয়ে গোটা ভারতবর্ষে টিকে রইল প্রায় দুশো বছর। মোটামুটি আটশো বছরের বাংলাদেশের সুবিশাল ও সুবিস্তৃত পটভূমিতে ব্রিটিশ শাসনের দুশো বছরের বাংলাদেশকে দেখতে চেয়েই আমি ছেদের কথা বলেছি, ঐক্যসূত্র ছিঁড়ে পড়ার কথা বলেছি, ইতিহাস আর সময়ের জোর খুলে যাওয়ার কথা বলতে চেয়েছি। কারণ এই বদলটা আর মাথার উপর চেপে বসা শাসকদের বদল নয় এই বদল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভাবগত, চিন্তাগত, প্রায় বিশ্ব-সমীকৃত রাষ্ট্রভাবনা, আর্থসামাজিক কাঠামোগত ভাবনা, প্রবল পশ্চিমের মনন-চিন্তনের অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা। এইটাই হচ্ছে অতীতকে ছিঁড়ে আলাদা করে ফেলা, নতুন পৃথিবীতে ঢুকে পড়া, নো-ম্যান্স ল্যান্ড পার হয়ে এসে ভিন্নতর বাস্তবতায় পা ফেলা। দুশো বছরের এই বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-মনন-সংস্কৃতি নিয়ে ভাবনা আসলে আর এক জটিল বাস্তবতায় প্রবেশ করা। বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের কথায় একে বাদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তাতে অঙ্গহানি হতে হতে হৃদয়-মস্তিষ্কের মতো অঙ্গও বাদ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Ad-Graphics1\E\Advertisement/April\13-04-2016\Advertisement_10